BANGABHARATI - A National Research Journal of Bengali
ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

নীল ময়ূরের যৌবন : একালের চর্যাপদ

ড. অমিত ধাড়া
সহকারী অধ্যাপক , এম.জে.এম মহিলা কলেজ, কাটিহার, বিহার।

প্রবন্ধসার

চর্যাপদের বয়স কমবেশি হাজার বছর। আর তাকে নিয়ে চর্চার বয়সও কমবেশি শতবর্ষ উত্তীর্ণ। সমালোচনা সাহিত্যের পাশাপাশি মৌলিক বা রস সাহিত্যেও চর্যাপদ প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যকে নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত করে চলেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বোনের মেয়ে থেকে শুরু করে বাংলাদেশের লেখিকা সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' তার প্রমাণ। বর্তমান আলোচনায় সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের মধ্যে চর্যাপদের সমকাল ও বর্তমান সময়ের যে বন্ধন ধরার চেষ্টা হয়েছে, সে বিষয়ে আনুপূর্বিক প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক উপন্যাস কীভাবে নবমাত্রা পায় প্রাচীন প্রসঙ্গে – তারই বিশ্লেষনাত্মক রূপটি বর্তমান আলোচনায় সহজলভ্য।

কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র চলচ্চিত্র রূপ অনেকের ভালো লাগেনি, ভালো লাগেনি 'শিন্ডলার্স লিস্ট' ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহুদি পীড়নের ঘটনা নিয়ে আবারও একটি চলচ্চিত্র। অপছন্দের কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছিলেন এ যুগে এই বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা কী ? সেলিনা হোসেন-এর 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস নিয়ে একই প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ চর্যাপদ মিশ্রিত এই কাহিনীর পটভূমি বাংলাসাহিত্যের একেবারে প্রাচীন তথা আদিকালের ঘটনা। আর সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' একুশ শতকের কথাসাহিত্য। কালের দিক থেকে 'চর্যাপদ' ও সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস ভিন্ন ভিন্ন দুই যুগকে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে দুই ভিন্ন ধর্মী সাহিত্যের প্রসঙ্গ নিয়ে তুলনা টানা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। আধুনিক উপন্যাসকে চর্যাপদের পটভূমিতে মিলিয়ে দেখার প্রয়াস রীতিমত অভিনব ঘটনাও বলা যায়। একুশ শতকে সূচনা লগ্নে দাঁড়িয়ে সেলিনা হোসেনের এই প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে আরও এক সাহসী পদক্ষেপ। এখন প্রশ্ন হল যা বর্তমানকালে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক কেবল সেটিই কি আমাদের কাছে মূল্যবান ? এ কাল কি এতই গুরুত্বপূর্ণ ? যে অতীত থেকে আজ আমরা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে সেই অতীত সব সময়ই প্রাসঙ্গিক থাকে। কারণ তা আমাদের বর্তমানের অবস্থান চিনিয়ে দেয়। শিল্পী সব সময়ই অতীতের দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হন এবং তাঁর কল্পনা সঞ্জীবিত হয়। সেই কল্পনার সঞ্জীবিত রূপ সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের প্রভাব অনস্বীকার্য। চর্যাপদ রচনার পটভূমিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আর্য ও অনার্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনকে চর্যার কবিগণ গুরু সাধনার প্রণালী দ্বারা সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। চর্যার সাধ্য সাধন ধর্ম প্রণালীর মধ্যেই শোষণ নিপীড়নের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। আধুনিক ভারতের আত্মার মধ্যে সেই শোষণ ও নিপীড়নের চোরা স্রোত আজও সমানভাবে বয়ে চলেছে। 'যাপিত জীবন', 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি'র লেখিকা সেলিনা হোসেন অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদের সময়কালের পটভূমিতে রচনা করলেন 'নল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস। যা একান্তভাবে বাংলা ও বাঙালির কথা। চর্যাপদে পদের কবি কাহ্নু পাদ অসহায়। কিন্তু গ্রাম

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

ভারতের কবি কাহ্নপাদ স্বপ্ন দেখেন স্বাধীন ভূখন্ডের। যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল নিপীড়ন থাকবে না। তার মুখের ভাষা হবে রাজদরবারের ভাষা। স্বপ্নসন্ধানী ভাবুক কবি কাহ্নুপাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। প্রতিবাদের পুরস্কার স্বরূপ কাহ্নুপাদের দু'হাত কেটে দেওয়া হয়। ডোম্বিকে ফাঁসি গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রাজার লোকেরা মধ্যরাতে অনার্য পল্লীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। যারা বাঁচতে পারে তারা পালিয়ে যায় পাহাড়ের পাদদেশে। সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসে চর্যাপদের পটভূমিতে আধুনিক ভারতে ব্রাহ্মণ্যদের প্রবল নিপীড়ন তুলে ধরেছেন।

'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'– 'মেঘবরণ চুল শবরীর, তেমন তার গোছা। দুপুরের পর থেকে শুরু করেছে কাঁকইয়ে ধরে না'(পৃঃ-১)। কাহ্নুপাদ কবি। সে সুন্দরের পূজারী। 'ওর মনে হয় সৌন্দর্যচর্চা প্রার্থনার মতো, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে না থাকলে প্রার্থনা ছুটে যায়। ছুটে গেলে ঈশ্বরকে যেমন একমনে ডাকা যায় না, তেমন সৌন্দর্যচর্চাতেও খুঁত থাকে। তখন অস্বস্তি হয় ওর। নিজেকে আর কিছুতেই সৌন্দর্যের স্রষ্টার ভূমিকায় রাখতে পারে না।' (পৃঃ-১) বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম দর্শনে নির্বাণ বা মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় কঠোর সাধনা। সেই সাধনাতেও কোনো খুঁত থাকা চলে না। কিন্তু প্রশ্ন হল কাহ্নুপাদ কি বৌদ্ধ ? যদি হয়ে থাকে তাহলে তার মুখে মন্দির, বেদ কেন ? কাহ্নুর সৌন্দর্য সাধনায় শবরী এক পবিত্র মন্দির। সারাক্ষণ সেখানে আরতির ঘন□শুনতে পায়।

শবরী সারাদিন কাহ্নুর জন্য পথ চেয়ে বসে তাকে। যেমনভাবে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভক্তের পরম আকুতি দেখা দেয়। 'সারাদিন কাহ্নুপাদের দেখা মেলে না। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজদরবারে ওর সময় কাটে। ... শবরী বোঝে রাজদরবারে কাজ অনেক সম্মানের, ছাড়বে কেন কাহ্নু ?' (পৃঃ-২) রাজদরবারে কাহ্নু পাখা টানার কাজ করে। সারাদিন পাখা টেনে যেতে হয়। একটু ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলেই ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান। তবু এই স্থায়ী চাকরি ও আত্মসম্মানবোধ আধুনিক জীবন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। তবে একমাত্র অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কাহ্নুর রাজদরবারে কাজ করার ঘটনার মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। রাজা অন্ত্যজ শ্রেণির উপর নিজের প্রতিনিধিত্বর কায়েম রাখার জন্য কাহ্নুর মতো নেতাকে ব্যবহার করেছেন। এই ঘটনা ব্যতিক্রমী নয় যা রামায়ণ, মহাভারত, মধ্যযুগের সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। আর আধুনিক ভারতবর্ষেও সেই ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি। 'প্রতীক্ষার সময় খুব খারাপ সখি। আর সেই জন্যই মিলন এত মধুর।'(পৃঃ-২) কবি কাহ্নু একজন আশাবাদী মানুষ। তিনি জানেন তার সংগ্রামের পথ কন্□কীর্ণ। পথ কঠিন বলেই শবরীর প্রতীক্ষা একটু ভালোবাসা যেমন গাঢ় তেমনি মধুর। কাহ্নু স্বপ্ন দেখে অন্ত্যজ শ্রেণির একটা নতুন দেশ হবে। সেই দেশের রাজাও তারই সমাজের। যে সব সময় এই পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করবে।

'জানো সখি নেশা হওয়ার পর তোমাকে আর বৌ বলে মনে হয় না। মনে হয় অন্য নারী। যে নারীর ওপর কোনোওধিকার নেই, অথচ যাকে পাওয়ার আকাঙ্খা দুর্বার হয়ে ওঠে। যাকে পাওয়ার জন্য মন পাগল হয়ে যায়।' (পৃঃ-৪) নিজের স্ত্রীকে নতুন করে দেখার মধ্যে এক শিল্পী মনের আকাঙক্ষা প্রকাশিত হয়। কাহ্নু রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে। রাজা বুদ্ধ মিত্রের অশেষ দয়ায় এই কাজ তার জুটেছে। নইলে ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড প্রতাপে তার পাশে যাবার সাধ্য নেই, অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেদের। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং পরিষদের অন্যান্যরা ব্যাপারটা সুনজরে দেখে না। সব সময় এটা ওটা নিয়ে ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। পেছনে লেগে থাকে। এটা আসলে অনার্য তথা পিছিয়ে পড়া শ্রেণি শোষণের চিত্র। যা

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারা প্রতিপালিত তা সযত্নে বর্তমানে চলে আসছে। কিন্তু কাহ্নু অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে বেঁচে থাকার পথ রচনা করেছে। সে পথ কবিতার পথ। তার প্রতিবাদের ভাষা কবিতা —

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্দেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।।(পৃ-৫)

পাখা টানতে টানতে কাহ্নু প্রকাশের পথ খোঁজে। ভিতরে কি যেন এক জ্বালা। অজানা যন্ত্রণায় সে ছটপট করতে থাকে —

কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো উআস।।(পৃ-৬)

ঘুমের মধ্যে কাহ্নু বিড়বিড় করে। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার, পথও বন্ধ। এগুতে পারছে না। নিজের কবি সত্ত্বার আত্মপ্রকাশের অক্ষমতা তাঁকে যেমন যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে। অন্যদিকে নিজেকে প্রমাণ করার অদম্য ইচ্ছা তাঁকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখে। তবে কাহ্নুর সংগ্রামের পথে শক্তি যোগায় শবরী। বাড়িতে অন্নের অভাব। সে কাহ্নুর জন্য নদীর ধার থেকে কাঁকড়া ধরে আনে। আর তাই দিয়েই কাহ্নু চেটেপুটে খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর টোলে।

গ্রাম ভারতের বেশিরভাগ লোকই চাষাবাদ করে, কেউ কার্পাস বোনে। বাকিরা চাঙারি বানায়। নয়তো শিকার করে। আদি চর্যার কবি দেশাখ আজ ব্যবসায়ী। ওর বৌদি সুলেখা বড় দ্রুত চাঙারি বোনে। দেশাখ ওগুলো নিয়ে শহরে বিক্রি করে আসে। এর বাইরে তীরধনুক ছাড়াও আর কিছু বুঝতে চায় না। পথের পাশে কামোদের মুদির দোকান। বেশ খানিকটা এগুলো রামক্রীর মদের দোকান। রামক্রীর বৌ দেবকী মদ চোলাই থেকে আরম্ভ করে খদ্দের আপ্যায়ণ এবং কড়ির হিসাব সবই অবলীলায় করে। দেবকীকে খুব পছন্দ কাহ্নুপাদের। দেবকী দারুণ সতেজ, স্নিগ্ধ। শবরীর সৌন্দর্য ধনুকের ছিলার মতো টানটান, শানিত। কিন্তু দেবকী অসম্ভব নমিত, দৃষ্টি আঁকড়ে রাখে, ব্যাকুল করে, শবরীর মতো উদ্দাম করে না। অথচ বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে, যেন বকুল ছায়া, স্নিগ্ধ এবং গন্ধময়। আর এদের বাচ্চারা সকলেই ছোট থেকে শিকারের তালিম নেয়। একমাত্র ছুটকির ও সব একদম পছন্দ নয়। কাহ্নু কাকার কাছে তার আবদার রাজবাড়ি দেখার, রাজার সিংহাসন দেখার। কাহ্নু জানে রাজার প্রহরীরা ওকে ঢুকতে দেবে না। জন্মগতভাবে ওখানে ঠোকার অধিকার অর্জন করেনি ও। ওকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নগরের বাইরে ওর মত শত শত লোককে কেমন নির্বিবাদে আলাদা করে দিয়েছে ওরা। ওদের জন্য দেশের রাজার কোনো দায়ভার নেই। ধর্মে কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে বিধি-নিষেধে আইন-কানুনের হোতা সেজে আছে ব্রাহ্মণরা। শত অপমান সহ্য করে, বুকে অসম্ভব জ্বালা নিয়ে এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে হয় কাহ্নুকে। এতবড় রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা তার একার নেই। তার ওপর পায়ে লাগানো আছে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা গোলামীর ফাঁস। সেখান থেকে ইচ্ছে করলেও বেরিয়ে আসতে পারে না। নদীর ঘাটে নৌকায় খেয়া পারাপার করে ডোম্বী। অদ্ভুদ প্রাণবন্ত মেয়ে। কাহ্নু নাম রেখেছে মল্লারী। নৌকা যেমন অবলীলায় বায়, তেমনি গাইতে পারে, নাচতে পারে। এমন সরেস মেয়ে এ অঞ্চলে একটিও নেই। ওকে দেখে কাহ্নুর মনে হয় পৃথিবীকে যেন শাসন করতে এসেছে। সব কিছুতে ওর গভীর অধিকার আছে। বিধাতা ওদের জন্য প্রাণভরে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু রাজসভায় গেলে টের পাওয়া যায় কিছুই ওদের জন্য নয়। সব ওদের যারা উঁচু বর্ণের। ওরা ভোগ করবে-খাবে-ফেলবে-ছিটাবে। যেটুকু কাঁটাকুটো তা ওদের জন্য-যারা নীচু জাতের, যাঁদের শরীরে নীল রক্ত নেই। ওইটুকু চেটেই ওদের খুশি থাকতে হবে, কিন্তু চাইতে পারবে না।

অন্ত্যজ শ্রেণির অধিকারের আবেদন নিয়ে রাজা বুদ্ধমিত্রের কাছে আসে পণ্ডিত সুধাকর। কিন্তু রাজা জানান 'আইন তৈরির সব ক্ষমতা দেবল

ভদ্রের, আপনি তো সবই জানেন পণ্ডিত সুধাকর।' (পৃ-৫৬) আসলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্র বৌদ্ধ রাজাকে পরিচালিত করে। রাজকাজের সব ব্যাপারে তার মুখের কথাই আইনে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণদের নারীভোগের আইনের বিরুদ্ধে সরব হয় পণ্ডিত সুধাকর। বলাই শর্মা ব্রাহ্মণ এবং রাজার লোক। দিনের বেলায় ডোম্বীর মতো অন্ত্যজ মেয়েদের থেকে দশ হাত দূরে থাকে কিন্তু 'রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি ওর দরজায় দাঁড়িয়ে টুকটুক শব্দ করে। কেন না দেবল ভদ্র ব্রাহ্মণদের জন্য দুটো আইন তৈরি করেছে। এক, ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে-কোনো ধরণের মেলামেশা করতে পারে, সে যদি যার বিবাহিত স্ত্রী নাও হয় তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এমনকি তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে সংসর্গ দোষ ছাড়া অন্য নৈতিক অপরাধ হবে না। দুই, অন্যের বিবাহিত নিম্নবর্গের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যাভিচার করা কম দোষের হবে। তবে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহ করা অমার্জনীয় অপরাধ।' (পৃ-৫৫) আর সেই জন্যই আধো-অন্ধকারে ডোম্বীর দীঘল দেহের মোহন ভঙ্গি বলাই শর্মার চোখের তারায় আটকে থাকে, দৃষ্টি ফেরানো কঠিন। বলাইয়ের কণ্ঠ শুকিয়ে যায়। 'বিড়বিড়য়ে বলে, কীসের পাপ ? এমন শরীরের ছায়াতেই সব পুণ্য। ওহ মরণেও এমন সুখ! বলাই শর্মা কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বলে, এবার তোমার সব কর মাফ করে দেবো ডোম্বী।' পৃ-৫৪) তাই দেশাখ কবি কাহ্নু পাদকে প্রশ্ন করে 'আমরা কেন ছোটলোক ? কী আমাদের অপরাধ ? আমাদের কী নেই ?' (পৃ-৫৯) এই ভাবেই ধীরে ধীরে অনার্য জাতির মধ্যে অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। কাহ্নু লবলে 'আমি ঠিক করেছি চল আমরা ছোটলোকেরা আলাদা হয়ে যাই। আমাদের ভিতর একজনকে রাজা বানাই, একজন মন্ত্রী। তারাই আমাদের কথা ভাববে। আমাদের উপকার করবে।' (পৃ-৬০) এভাবেই শিকারের দল আস্তে আস্তে বিরাট বাহিনে পরিণত হয়।

কুক্কুরীপাদ সংসার পছন্দ করে না। উদ্দাম, মুক্ত ও প্রেমময় জীবন ওর কাম্য। সন্ধ্যাকে নিয়ে ও পাহাড়ে তাকে। কাহ্নু র থেকে রাজার আইনের কথা শুনে হা হা করে হেসে কুক্কুরী গায় –

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খঅ।।(পৃ-৬১)

দেশাখের পথের সঙ্গী হয় বিশাখা। বিশাখাকে তীর ধনুক চালানোর তালিম দেয় সে। দেশাখ বিশাখার হাতে হাত রেখে স্বপ্ন দেখে বিরাট এক ধনুক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে ও। অন্যদিকে কাহ্নু পদ রচনা করে – 'ভবনির্বাণে পড়হ-মদলা/মন বপন বেণি ক রণ্ড ক শালা।।/জঅ দুন্দুহি-সাহ উছলিআঁ/কাহ্নু ডোম্বি-বিবাহে অলিঅ।।' (পৃ-৯৪) ডোম্বী খিল খিলিয়ে হাসে বলে পারলে দেবল ভদ্রের বাড়িটা পুড়িয়ে দাও। ভুসুক কাহ্নুকে নিজের লেখা এক পদ শোনায় – 'আপনা মাঁংসে হরিণা বৈরী।' কাহ্নু বলে তুমি অনেক বড়ো কবি ভুসুক। আর তারপর ভুসুক গেয়ে ওঠে 'তিন ণ ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী।/হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জানী।' (পৃ-১২৭) আর সংগ্রামের আগের রাতে কাহ্নু গীত লেখে 'নগর বাহিরেরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুঁড়িআ।/ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআ।।' (পৃ-১২৮) শবরী গীতটা শুনে প্রথমে থমকে থাকে। তারপর চেঁচয়ে বলে ঠিকই লিখেছো। কানু। পরের দিন রাজার লোকেরা কাহ্নুকে ধরে নিয়ে যায়। কারণ কাহ্নুর এই গান অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সংগ্রামের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। কাহ্নুর হাত পিছমোরা। কোমরে দড়ি। শবরী কাঁদতে তাকে। কিন্তু ডোম্বীর চোখ থেকে আগুনের ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। কাহ্নুকে চুনের গুদামে আটকে রাখা হয়। কাহ্নুর মৃত্যুদণ্ড হয়। তবে রাজা শর্ত দেয়– 'তুই এক শর্তে ক্ষমা পেত পারিস, যদি তুই রাজার প্রশস্তি রচনা করিস এবং নগরে পল্লীতে সর্বত্র তা গেয়ে বেড়াবি।' (পৃ-১২৯) উত্তরে কাহ্নু জানায় সে রাজাকে চেনে না। রাজা তাদের কেউ নয়।

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

ডোম্বিকে পাওয়া যায় না। রাজার লোকেরা তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে ডোম্বিকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। রাজার আইন অনুযায়ী ফাঁসি গাছে তিনদিন ঝুলিয়ে রাখা হবে ডোম্বির লাশ। গীত রচনার অপরাধে কাহ্নুর কব্জি হতে হাত কেটে বাদ দেওয়া হয়। রাজার লোকেরা মধ্য রাতে পুড়িয়ে দেয় অন্ত্যজ পল্লী। যাঁরা বাঁচে তারা পালিয়ে যায় শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয় নতুন করে শক্তি অর্জনের জন্য। তাই ওদের নাকে চামড়া পোড়ার গন্ধ ভেসে এলে কবি ভুসুক চেঁচিয়ে বলে 'আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী।' এমন রক্ত আগুনের মধ্যে দিয়ে তো কাহ্নু পাদের স্বপ্নের ভূখণ্ড বাংলাদেশ হয়ে যায় ...। আর সেলিনা হোসেনের হাতে রচিত হয় আধুনিক ভারতের নতুন চর্যাপদ 'নীল ময়ূরের যৌবন'। যার নামকরণ হতে পারে একালের চর্যাপদ।

গ্রন্থঋণঃ

১। সেনগুপ্ত, ডঃ নীতিশঃ
বঙ্গভূমিও বাঙালির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, কলকাতা

২। শ, রামেশ্বরঃ
আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৩। চক্রবর্তী, সুমিতাঃ
উপন্যাস বহুরূপে, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১২, কলকাতা

৪। লাহা, চিত্তরঞ্জনঃ
মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৭, কলকাতা-০৯

৫। হোসেন, সেলিনাঃ
নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, ২০০৯, কলকাতা

৬। বসু, মণীন্দ্রমোহনঃ
চর্য্যাপদ২০১০, বামা, কলকাতা।